বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

৪৯ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা ১৫ মার্চ, ২০২৬, রবিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৪৩২
Vol. 49, Special Issue , Saturday, 15 March 2026

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

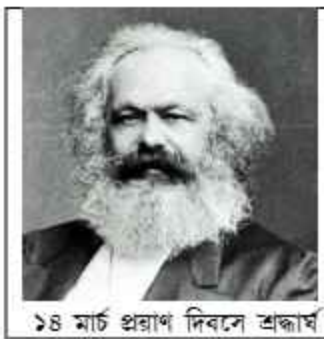

১৪ মার্চ প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ

সৌজন্যে – পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদ ও পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন

R.O. Number 120(102)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 13.03.2026

সুকান্ত ভট্টাচার্য : বাংলা কাব্যের এক ‘বাতিওয়ালা’ কবি

অনন্য ভট্টাচার্য

সুকান্তের কাব্যজীবনের সময়কাল অতি সংক্ষিপ্ত। ১৯৪০-৪৭ মাত্র সাত বছরের মধ্যেই তাঁর উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয় কবিতাগুলি রচিত হয়েছে। বলা যেতেই পারে যে, বিগত শতকের চল্লিশের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুকান্তের কাব্যপ্রতিভা স্ফূরণের সহায়ক হয়েছিল। তার ঠিক আগে বাল্যকাল ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণে যে বিষয় ও ভাবনা নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন সেখানে নিঃসঙ্গতা, হতাশা ও নৈরাশ্যে ডুবে থাকা এক বালক কবিকে পাই যে গৃহকোণে নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দি করে রেখেছে। বাইরের জনজীবনের কোলাহল তাকে স্পর্শ করে না। বরং নিজেকে এক নির্বাসিত মানুষ বলেই সে মনে করছে। তার মনে হয়েছে চতুর্দিকে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা। জীবনের উষ্ণতাকে আলিঙ্গন করার আগ্রহ তো দূরের কথা, কবি অনুভব করছেন প্রায়শই হিমশীতল মৃত্যুর ঘ্রাণ। মৃত্যু বিষয়ক দার্শনিক ভাবনাও তাঁর চেতনায় এসেছে সেই সময়— ‘আমরা বুদ্বুদমাত্র জীবনের স্রোতে।’ ‘অন্ধকারে কি মৃত্যুর বিস্তার’ দেখে কবির মন তখন শঙ্কিত ও ত্রস্ত। সবমিলিয়ে এক ধরনের নেতিবাচক জীবনবিমুখ ভাবনা, আর অনিকেত চেতনা কবিকে তখন জগত ও জীবন সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছে। জনজীবনের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্নতার অনুভূতির কারণেই কবি নিজেকে নির্বাসিত ও দুর্ভাগা বলে অভিহিত করেছেন এই সময়।

এই নিশ্চেতন ঔদাসীন্য আর হীনমন্যতার বোধ থেকে কবি মুক্তি পেলেন উত্তাল চল্লিশের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে। তখন ভারত-ছাড় আন্দোলন তুঙ্গ পর্যায়ে। স্বাধীনতার প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ভারতবাসী আবেগে অস্থির। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ-বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতিতে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে নতুন রাষ্ট্র গঠনের তোড়জোড় চলছে। আবার ঐ সময়কালেই ঘটে গেছে ভয়াবহ মন্বন্তর। দুর্ভিক্ষ কবলিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এক ভয়াবহ দৃশ্য রচনা করেছিল কলকাতা নগরীতে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এল দেশভাগের মধ্য দিয়ে। দেশ বিভাজন হলেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা-অশান্তি বেধেই রইলো। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও তার ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ায় গোটা বিশ্ব এমনকি ভারতের অর্থনীতিও তখন রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত। এক তীব্র অনিশ্চয়তার বোধ, কর্মহীনতার যন্ত্রণা, বেকারিত্বের জ্বালা কুরে কুরে খাচ্ছে তখন সমকালীন তরুণ সম্প্রদায়কে। এরই প্রতিক্রিয়ায় শাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে তখন দিকে দিকে। ঠিক এই সময়েই বাংলা কবিতার জগতে সুকান্তের আবির্ভাব। নৈরাজ্য আর শোষণের চরমতম রূপ আর প্রিয় স্বদেশভূমির হৃতশ্রী দশা প্রাথমিক ভাবে তাকে বিহ্বল করে তুলেছিল। তারই প্রকাশ ঘটেছে ছাড়পত্র-এর কবিতাগুলিতে।

অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি!
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
...অবাক পৃথিবী অবাক যে বারবার।
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।

‘এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম’ এই অনুভব কবিকে বেদনাহত করলেও এই লাঞ্ছনা আর অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য বিদ্রোহ আর বিপ্লবই যে একমাত্র পথ তা তিনি নিজের রাজনৈতিক বোধ ও চেতনা দিয়েই অনুভব করেছেন। বস্তুত তখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে যে বৈপ্লবিক চেতনার জন্ম হচ্ছে সে সম্পর্কেও সুকান্ত ওয়াকিবহাল ও আশাবাদী ছিলেন। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সংঘটিত হওয়া গণবিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বের চেহারাটি ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়—

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
এতো বিদ্রোহ কখনো দেখিনি কেউ
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।

বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ আর গণবিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানবমুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে, সুকান্তের মধ্যে এই বোধ ও অনুভূতির জাগরণ ঘটেছিল চল্লিশের দশকের উত্তাল-উদ্দাম রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই। বালক বয়সে যে কবি হতাশা ও নিশ্চেতনা বোধে আক্রান্ত ছিলেন এক বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিতে সেই সংকীর্ণ গৃহকোণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তিনিই যে যুক্ত হবেন স্বদেশ ও বিশ্বের মানবমুক্তির আন্দোলনে ‘১৯৪১ সাল’ কবিতাতে রয়েছে তার স্পষ্ট প্রকাশ—‘একক পৃথিবী ভেসে গেল জনতার প্রবল জোয়ারে।’

তবে সুকান্ত দেশ বলতে শুধু ভারতবর্ষকে বোঝাননি। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি দেশে দেশে ঘর খুঁজেছিলেন। মানবমুক্তির যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা শুধু দেশের মানুষের জন্য নয়। দেশ তাঁর কাছে কোনও ভৌগোলিক সীমারেখা মাত্র ছিল না। ইউরোপ সহ প্রাচ্য দেশের নানা প্রান্তে অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে যে লড়াই ও গণবিক্ষোভ সংঘটিত হচ্ছে দিকে দিকে সেই লড়াইয়েরই এক সৈনিক ও সহযোদ্ধা বলে তিনি মনে করতেন নিজেকে। ইউরোপে একদিকে তখন চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্যদিকে হিটলারের নাৎসিবাহিনি ও ফ্যাসিস্টদের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে মানবনিধন যজ্ঞ। এই পরিস্থিতিতে শুধু নিজের দেশের স্বাধীনতা নয়, সুকান্তের কাছে বিশ্বের প্রতিটি অত্যাচারিত ও শোষিত মানুষের মুক্তির প্রশ্নটিই অগ্রাধিকার পেয়েছিল। ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ফ্যাসিস্ট, নাৎসি বাহিনি আর সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের লড়াই ও আন্দোলন উদ্দীপ্ত করেছিল তরুণ কবি সুকান্তকে। মানবমুক্তির একমাত্র দিশা হিসেবে তিনি আশ্রয় খুঁজেছিলেন মার্কসীয় চেতনাদীপ্ত রাজনৈতিক চিন্তার জগতে। তাত্ত্বিক পড়াশোনা খুব গভীর না হলেও নিজস্ব বোধ ও উপলব্ধির সাযুজ্যে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক সমাজ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তিভূমি ছিল মার্কসবাদ।

সুকান্ত তাঁর সারা জীবনের কাব্যচর্চায় একজন আদর্শনিষ্ঠ মার্কসীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ পার্টিজান হিসেবেই মার্কসীয় চিন্তাচেতনা ও সাম্যবাদী ভাবনাকে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর পাঠকমহলে। তাঁর কবিতা তাই প্রথমত রাজনৈতিক, দ্বিতীয়ত তা কাব্য। কবিতার মধ্য দিয়ে নিজের রাজনৈতিক বক্তব্যকে প্রকাশ করাই শুধু নয়, তাঁর উপলব্ধি কতখানি গভীর ছিল তা বুঝতে পারি আমরা কবিতায় প্রতিফলিত তাঁর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রত্যয়ী উচ্চারণ ও শপথের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে।

১. রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল
২. শপথের বিধি নিয়ে চলো আজ ভীরুতা পিছনে ফেলে
৩. এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি

এমনকি তাঁর কবিতায় বারংবার ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যবন্ধগুলিও তাঁর মার্কসীয় চেতনায় দীক্ষিত কবিচেতনা থেকেই উৎসারিত। এই শব্দ ও বাক্যগুলি স্পষ্ট, প্রত্যয়দীপ্ত, উচ্চকিত ও স্লোগানধর্মী। সংগ্রাম, বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, আন্দোলন, মিছিল, মুষ্টিবদ্ধ হাত, বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, রক্তিম অভিবাদন, লাল দিন, দিনবদলের পালা প্রভৃতি শব্দগুলি সুকান্তের রাজনৈতিক কবিতার হাতিয়ার হিসেবেই এসেছে। এটা স্পষ্ট যে, সুকান্তের কবিতা শুধুই রাজনৈতিক নয়, তা প্রচারধর্মীও বটে। এই প্রচারধর্মিতার কারণেই সুকান্তের কাব্যের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন অনেকে। কিন্তু মনে রাখা দরকার প্রচারধর্মী সাহিত্যও চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা ও স্থায়িত্ব পেতে পারে যদি তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সততা থাকে। সুকান্ত তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক বক্তব্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার মধ্যে দৃঢ়তা, নৈতিকতা ও সততার অভিব্যক্তি ছিল বলেই পাঠকের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শুধু সমকালেই নয়, উত্তরকালের কয়েকটি প্রজন্মের মধ্যেও বামপন্থী চেতনা ও মতাদর্শ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুকান্তের কাব্য এক সহায়ক ভূমিকা পালন করে গেছে। সুকান্তের কবিতা রাজনৈতিক আদর্শ ও সততার বোধে প্রোজ্জ্বল বলেই তা ভাবীকালের পাঠকের চেতনাকে আলোড়িত ও স্পন্দিত করেছিল। তবে সুকান্তের কবিতা শুধু রাজনৈতিক ভাবনা প্রচারের ইশতেহার মাত্র নয়। আর তা বোঝা যায় কেবল সুকান্তের কবিতার নিবিড় পাঠপরিক্রমার মধ্য দিয়েই। কবিতার নান্দনিক সুষমা রক্ষার্থে যে ভাষা, ছন্দ, অলংকার তিনি নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে নিজস্বতার দীপ্তি তো রয়েছেই, তাছাড়া কাব্যের প্রকরণগত কুশলকৌশল নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও পরিমিতিবোধ কতখানি গভীর ছিল তারও নিশ্চিত স্বাক্ষর রয়েছে কবিতাগুলিতে।

তবু বুদ্ধদেব বসুর মতো কবি ও সমালোচক যখন সুকান্তের কবিত্বশক্তির প্রশংসা করেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক কবিতা লিখে শক্তির অপচয় করছে বলে খেদ প্রকাশ করে সুকান্তকে তির্যকভাবে বিদ্ধ করেন এবং বাংলা কাব্য জগতে সুকান্তের কবিতা স্থায়িত্ব পাবে কিনা সে বিষয়ে রীতিমতো সংশয়ী হয়ে ওঠেন তখন মনে করিয়ে দিতেই হয় সুকান্তের কয়েকটি কবিতার কথা যেখানে জীবন সম্পর্কিত এক গভীর দার্শনিক চিন্তনের রূপটি ফুটে উঠেছে। যেমন ছাড়পত্র কাব্যের—

আর মনে করো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।

একদিকে প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের পরিবর্তন অন্যদিকে মানবজীবন ও সমাজের অনিবার্য পরিবর্তনটিকে একসূত্রে বেঁধে শাশ্বত মানবতার অপ্রতিহত, অজেয় গতিবেগকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন এই কবিতায় তার মধ্যে দিয়ে সুকান্তের কবি চেতনায় এক গভীর দার্শনিক চিন্তনের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। তাই আক্ষেপ থেকেই যায়। জীবনের বহুমাত্রিক রূপ, বৈচিত্র্য, আর মানবমনের অন্দরমহলে সংগুপ্ত থাকা নানা বিচিত্র অনুভূতি যার বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে সমগ্র জীবনকে ধরার যে আকুতি যে কোন সাহিত্যিকেরই কাম্য, তা ছিল না সুকান্তের। তবে খুব ধীরে ধীরে তাঁর কবিতায় পরিবর্তন আসছিল এটাও সত্যি। হয়তো পরবর্তীকালে এক নতুন জীবনদর্শনের ও জীবনভাবনার প্রজ্ঞাদীপ্ত উদ্ভাস আমরা পেতাম তাঁর কবিতায়। রাজনীতির চেয়েও বড় যে জীবন তার বহুবর্ণময় রূপটিকেও আমরা পেতাম সেই সঙ্গে। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি, ভগ্নস্বাস্থ্য আর অকাল মৃত্যুর কারণে সেইসব কবিতা সৃষ্টির সুযোগ আর পেলেন না তিনি।

নানা রঙে রাঙানো জীবনের অন্দরমহলের দ্বারপ্রান্তে এসেও তার ভেতরে প্রবেশের ছাড়পত্র পেলেন না তিনি। তবে স্থবির আলস্য ও তন্দ্রাচ্ছন্ন জনজীবনকে ঘুম ভাঙার গান শুনিয়ে তাদের মনে প্রদীপ্ত শিখার মশাল জ্বেলে মানবতার ক্রমমুক্তির যে পথ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন সেই পথের একমাত্র আলোকবর্তিকা এখনও তিনিই, যিনি ছিলেন প্রকৃতই বাংলা কাব্যের এক ‘বাতিওয়ালা’ কবি।

ছায়ার বিজ্ঞাপন

সত্যজিৎ ভট্টাচার্য

শাসক কে যদি তুমি ভগবান মানো,
তখন তো অনুদানপুষ্ট নিজেকে
কৃপাধন্য বলে মনে হবেই
অনুগমনই হবে তোমার একমাত্র চলন
উনি পাঁচালীই হবে সর্বোত্তম কাব্য গাথা
আনুগত্যের ক্লিনারে মুছে যাবে সকল প্রশ্নচিহ্ন
বন্ধ পলকের মিঠে রোদে
ডানা ভেজাবে বাস্তু ঘুঘু
কালসর্পও ধর্মের ত্রিশূলের ছায়ায়
খুঁজে নেবে দুধ কলা
বিভেদের পর্বতের ভাঁজ বরাবর
হবে তোমার গতিপথ,
বদলে বদলে যাবে নাম—
দুরন্ত ঝর্ণা, স্রোতস্বিনী নদী অথবা বিদগ্ধ মোহনা

যে দেশের গায়ে এখনো ফসলের সুবাস
যে দেশের মানচিত্র আঁকা
তেল কালি আর মাটি দিয়ে
তার অতিক্রান্ত সীমানার বুক জুড়ে
ঘর বাঁধে অনিশ্চয়তার গন্ধ,
স্বপ্ন জুড়ে ছায়ার বিজ্ঞাপন,
আজাদী কি তবে সেনসেক্সের গ্রাফ?

ডুবন্ত মানুষই তো—
সাঁতার শেখায় ইতিহাসকে
প্রশ্নে, প্রতিবাদে
শাসককে যদি তুমি ভগবান মানো
তখন অনুদানপুষ্ট নিজেকে
পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলে মনে হবেই।

অবগুণ্ঠন

রীনা মিত্র

এই যে পচাগলা সমাজ কি করে বিশ্বাস করব একে?
চারদিকে বাস মুখোশধারীদের।
খুব চেনা-যেন সবার আপনজন।
মুখে ভালোবাসা, বুকে উদারতা; আরো কত কি!
ল্যাজ নাড়লেই ঢালে, পান্তা ভাতে গরম ঘি!
চারপাশে শুধু হেরাফেরি, সফেন সাদা পোশাক!
সময়ের অপেক্ষায় সময় চলে যায় ওরা দেখায় কেবল সার্কাস।

মার্কসবাদী মন

বিশ্ববন্ধু রায়চৌধুরী

আমার ভিতর বাহিরে,
অন্তরে অন্তরে,
আছো তুমি জীবন ভ'রে।
জ্ঞানের আলোয় এসে, চেতনায় শান্ দিয়ে,
শুধুই জেনেছি তোমারে।
শুধুই তোমারে।
তুমিই বলেছো মোরে, মালিকের পুঁজি আসে,
শ্রমিকের শ্রম চুরি ক'রে—,
রক্ত-ঘামের সেই শ্রম, চুরি ক'রে তারা আজ,
শোষণের স্টিমরোলারে পিষছে,
শ্রমিকদের বারে বারে!
তুমিই বলেছো—পুঁজির লোলুপতা,
কোথা থেকে কোথা সে যেতে পারে—
বিস্ময়ে দেখি শুধুই তার হিংস্রোরূপটি!
লাভের গুড় যদি দশ শতাংশ হয়,
তবে সে হয় প্রফুল্ল,
যদি সেই লাভ হয় বিশ শতাংশ, সে হয় উল্লসিত।
আর যদি দ্যাখে সে, লাভের বহর—হবে,
পঞ্চাশ শতাংশ—তবে সে ছোটে যেথায় খুশি।
আর যদি সেই লাভ হয় তিনশো শতাংশ,
তাহ'লে সে মালিককেও একবারের তরে—
খুন করতেও হয় না পিছুপা!
তোমার কাছে জানা, বুঝেছি শ্রেণি সংগ্রাম কি?
শ্রেণি সংগ্রাম ততদিনই থাকবে,
যতদিন শ্রমিক হবে না গো রাষ্ট্রের মালিক।
তোমারই মতবাদ, তোমারই দর্শন,
ভাববাদী দর্শনকে পথ দেখিয়েছো বস্তুবাদে।
তুমিই বলেছিলে, অকাট্য যুক্তি দিয়ে—
দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিতে...,
সমাজ পরিবর্তনশীল।
সমাজকে যায় পালটানো—
উদাত্তকণ্ঠে হাঁক দিয়েছিলে...
'দুনিয়ার মজদুর এক হও!'
আমার ভিতর বাহিরে,
অন্তরে অন্তরে,
আছো তুমি জীবন ভ'রে।
হে মার্কসবাদ।

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

৪৯ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা ১৫ মার্চ, ২০২৬, রবিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৪৩২
Vol. 49, Special Issue , Saturday, 15 March 2026

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

বিশেষ সম্পাদকীয়

বসন্তকাল সৃষ্টির সময়কাল। এই সময় আমাদের পরিবেশ সবুজ থাকে। রবি ফসল মাঠে পাক ধরতে শুরু করে। আম, লিচু প্রভৃতি ফলগুলি মুকুল মঞ্জরিত হয়। নানান রকমারি ফুল ফোটে। শিমুল, পলাশ, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া পরিবেশে মাদকতা আনে। এই সময়টা হলো সৃষ্টির সময়। কবি শিল্পীরা সৃষ্টি করেন নব নব রচনা। তাদের লেখা নিয়েই এবারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। আশাকরি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

আধুনিক কাব্য সাহিত্য নয়, বাঙালিকে ফিটফাট সাংবাদিকতার পথ দেখিয়েছেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত

বিশ্বজিৎ ঘোষ

মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যের জীবন-সাহিত্য বৃত্ত থেকে বাঙালিকে নতুন পথের দিশারি করেছিলেন-কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। মঙ্গল কাব্যে ধারার মতো তিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'কে একই ধারায় অনুসৃত করেননি। হয়তো মঙ্গল কথাটা যুক্ত আছে বলে আপাত অর্থে এটা মনে হতে পারে যে, এটি বুঝি মঙ্গল কাব্যের ঘরানার বৃত্তেই পর্যবসিত। কিন্তু কাব্যটি গভীরে পাঠ করলে বোঝা যায় যে মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যের আধিপত্যবাদ থেকে নতুন সাহিত্যরস আস্বাদনের পথ দেখিয়েছিলেন রায়গুণাকর। সেই অর্থে তিনি আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন।

এনার পরবর্তীকালে বেশ কয়েক বছর বাংলা কাব্য সাহিত্য স্থূল, রগরগে, নিতান্তই অতি সাধারণ মনোরঞ্জনের উপাদান হয়ে উঠেছিল। যার ফলস্বরূপ কবিগান, টপ্পা, আখড়াই, হাফ আখড়াই, মাথা সংস্কৃতি উঠে এসেছিল। বাংলা কাব্য সাহিত্য এই বৃত্তেই ঘুরপাক খাচ্ছে বেশ কয়েক বছর। এই সময়কালকে বাংলা কাব্য সংস্কৃতির অনুৎকর্ষতার সময় বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। তবে এই ধারাকে চোখের সামনে দেখে, এই ধারার মধ্যে থেকেই এবং প্রাথমিক ভাবে এই ধারার চর্চা করে, এই ধারা থেকে বাংলা কাব্য সংস্কৃতিকে যিনি বের করে সহজাত সংস্কৃতির আঙিনা তৈরি করেছিলেন এবং বলা যায়—বাংলা কাব্য সাহিত্যে যিনি প্রকৃত আধুনিকতার সূচনা করলেন তিনি ঈশ্বর গুপ্ত। কবিগানের বা মুখে মুখে প্রচলিত পাঁচালির সুর সংস্কৃতিকে বিদায় দিয়ে তিনি বাংলা কাব্য সাহিত্যে ব্যাঙ্গাত্মক ধারার প্রবর্তন করলেন। তবে তাঁর কাব্যে ব্যঙ্গের কশাঘাত থাকলেও কোন বিদ্বেষ ছিল না।

বাংলা কাব্য জগতে কবি ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন একথা প্রায় সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁর কাব্য সাধনা শুধু কাব্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি কাব্যের ধারাকে ফিটফাট সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে খুবই সাবলীল ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন—যে ধারা বর্তমান কর্পোরেট সাংবাদিকতাতেও বহুল প্রচলিত। তবে এই ফিটফাট সাংবাদিকতার কথাটি নিতান্তই মনগড়া কথা নয়। বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু এই পারিভাষিক শব্দ তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

সাংবাদিকতার রীতি, নীতি বা শৈলতা অনুসারে যখন কোন প্রতিবেদন বা রিপোর্টিং লেখা হয় বা অত্যাধুনিক বর্তমান মাধ্যম টেলিমিডিয়া চ্যানেলে প্রকাশিত হওয়ার মুহূর্তে কাঠখোট্টা সংবাদটুকুই প্রকাশিত হওয়ার রীতি—এটাই সাংবাদিকতার অলিখিত নিয়মাবলী। কারণ সংবাদপত্র পাঠক বা টেলিমিডিয়া দর্শক যেই হোক না কেন, ধরা হয় শ্রমিক, মজুর, যানবাহন চালক থেকে শুরু করে বিদেশসচিব পর্যন্ত সেই খবর বা সংবাদ আহরণ করে—তাই সেক্ষেত্রে কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক কোনো উদ্ধৃতি ছাড়াই কাঠখোট্টা সংবাদ পরিবেশন করাই নিয়ম।

কিন্তু একেবারে হাল আমলে এই ধারার বেশ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মুদ্রণ সংবাদপত্র থেকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদেও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য বা প্রচলিত উদ্ধৃতি সহযোগে খবর প্রকাশিত হয়।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর নিখাদ, নির্ভেজাল, মৌলিক কবিতাকে তৎকালীন সাংবাদিকতার কলমে তুলে এনেছিলেন। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পাষণ্ডপীড়ন' নামক সংবাদ পত্রিকাকে সম্পাদনা করেছিলেন এবং প্রথম সাপ্তাহিক, দৈনিক বাংলা পত্রিকার সূচনা করেছিলেন—শুধু এটাই তাঁর কৃতিত্ব নয়। তিনি বাংলা সাংবাদিকতাকে ও সাহিত্যকে সমান্তরাল ভাবে এক আসনে বসিয়েছিলেন। এই দিকটা একটু বিশদে বলব।

যদি বলা হয় সাহিত্য বনাম সাংবাদিকতা তাহলে এই বনাম শব্দের মধ্যে প্রতিযোগিতার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি সাহিত্যকে কিভাবে সাংবাদিকতার উপাদান করেছিলেন সে বিষয়ে একটু বিশদে আলোচনা করা যাক। তিনি লিখেছেন "দিনে মশা,রাতে মাছি এই তাড়ায়ে কলকাতায় আছি।" অর্থাৎ কলকাতার বাসস্থান চিত্রকে বোঝাতে গেলে এই কথা সাংবাদিকতাতে প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে থেকেই যায়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি বর্তমান পরিবেশে খবর পরিবেশনকালে সাহিত্যের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরের প্রাসঙ্গিকতা বোঝানো হয়। এই ধারার পথপ্রদর্শক ঈশ্বর গুপ্ত। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি তৎকালীন খ্রিস্টান ধর্মের আতিশয্যের ফলে গৃহিণী নারীকে যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন -সেই পঙ্কজ বর্তমানে নারীদের কার্যকলাপে অতিশয়োক্তি দেখা গেলে সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের নিম্নোক্ত শ্লোক আজও প্রাসঙ্গিক :

"যত ছুরিগুলো সব তুড়ি মেরে

—এরপর চারের পাতায়

শতবর্ষে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতি

দিলীপ সাঁতরা

এখন শতবর্ষ পরে প্রার্থনা করি
আবার জন্ম হোক প্রিয়তমাসু কবিতার স্রষ্টা
সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো কবি।

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা ভেঙেছিস ঘরবাড়ি
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে কখনো ভুলতে পারি?
বোধন কবিতায় এমন ঘোষণা যে কবির
তিনি নয়তো কিশোর কবি
সে কবি দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী যুগান্তরের পরিণত কবি।

মাত্র একুশ বছর নয় মাসের জীবনে
কমবেশি এগারো কিংবা বারো বছরে
যা কিছু কাব্য সাহিত্য সম্পদ রেখে গিয়েছেন
বাংলা সাহিত্য জগতে অমূল্য রত্ন হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে।

পরিপূর্ণ কবি সত্তা দিয়ে
তবেই তো কবি বলতে পেরেছেন
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
হায় আমাদের মানব সভ্যতা
কবি সুকান্ত অতৃপ্ত বাসনায় অকালে
তৎকালীন দুরারোগ্যে প্রয়াত হয়ে ইতিহাস হয়ে গেছেন।
আমরা এমনই হতভাগ্য কবির উত্তরাধিকার
আজও বিশ্ব পৃথিবী বাসযোগ্য হয়নি সবার।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম শতবর্ষে আসুন
আবার আমরা দৃঢ় শপথ গ্রহণ করি
প্রকৃতির মুক্ত বায়ু গ্রহণের মতো
খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের জন্য
সব মানুষকে সমান অধিকার দেবো
আর যেন বলতে পারি
যার যতটা সম্ভব কাজ করবে
যেমন তার দরকার তেমন তারা নেবে
রাষ্ট্র বাকি সব কিছুর দায়িত্বে থাকবে
কবির জন্ম শতবর্ষ উদযাপন
তবেই বোধকরি সার্থক হবে।

জন্ম শতবর্ষে সুকান্তের প্রতি

লক্ষ্মণ দাস ঠাকুরা

কোথাও উত্তাপের জ্বালা নয় শুধুই আগুনের ঘ্রাণ
মৃত্যু ধোঁয়ার আড়ালে জাগে আমাদের প্রাণ
অগ্ন্যুদগারে হতে চায় জাগ্রত বিস্ফুভিয়াস
পুঞ্জিভূত ক্ষুটন্ত লাভায় হবে আবার অধিবাস।
রক্তে লেখা হবে 'প্রিয়তমাসু'র বিদ্রোহী ভালোবাসা
মানুষ মিছিলে মিছিলে জানায় প্রতিজ্ঞা প্রত্যাশা
টলোমল দুর্দিনে আজ তোমার দৃঢ় নির্দেশ
দূর হয়ে যাক ওদের প্রতিদিনের মিথ্যা নগ্ন উপদেশ।

উদ্ধত জেহাদে কাঁপে ওদের থরথরো বুনিয়াদ
স্নায়ুতে স্নায়ুতে চলে বাঁচার শঙ্খ নিনাদ
আঘাতে আঘাতে এ দেশ হয়েছে দুর্বার দুর্জয়
হে কবি,তোমার আর একবার হোক অভ্যুদয়
প্রতীক্ষায় উৎকীর্ণ চারিধার, এসো বীর নির্ভীক
দিন বদলে তুমিই আমাদের কান্ডারী সৈনিক।

ঘুমিয়ো না

অশোক কুমার মহান্ত

এমন টা
ছিল না।
অথচ মূল যে ভাবে প্রোথিত হল
সেখান থেকে উঠিয়ে আনার
কোন প্রশ্ন নেই।
ছিন্ন ভিন্ন ভাবে উঠে এলেও
কথাগুলি ক্রমশ মাটি কাপাচ্ছে।
কণ্ঠস্বর না কাপলেও
তোমার হাত কাপছে।
আমার আঙুল এখন
চেপে বসছে।
সময় আমাদিকে দাড় করিয়েছে
গিরিখাতের কিনারে।
বড় অসময় হয়ে গেল হে।
রাত্রি গভীর হচ্ছে। এসো
যুদ্ধে নামি। ঘুমিও না।
কোলাহল উঠে আসছে।
গিরিখাত থেকে রাস্তায়
রাস্তা থেকে প্রাসাদে
আঙুল ক্রমে চেপে বসছে
সুড়ঙ্গও সুরক্ষিত নয়
দেবতাও জানে।
মরণই চিরকাল
জীবনের জন্য প্রশস্ত
পথ মেলে দিয়েছে।

পারলে জ্বালাও

তপোময় ঘোষ

না, গলায় কাপড় জড়িয়ে
আর তুলসীতলায় প্রদীপ
জ্বালানোর দরকার নেই
পারলে কাপড়টা গলা থেকে
কোমরে এটে বেধে
রাতে মালটা জ্বালাও
কারণ
বাড়িতে চোর আর বাইরে ডাকাত।
তাড়াতে হবে।

বসন্ত

বিবেকানন্দ চক্রবর্তী

শীতের চাদর ছুঁড়ে ফেলে যেই না উঠে বসি
ওমনি খানিক উড়ে এল হাওয়া
গগন মাঝে উঠল হেসে মায়াবিনী শশী
মন জুড়নো এটাই পরম পাওয়া

তোমার মুখে হাসি দেখে বেঁচে উঠি আজও
মন্ত্রবলে ফিরি তোমার কাছে
সহস্র রঙ মিশে গিয়ে মিলন মেলার সাজও
তোমার সাথে অমর হয়ে আছে।

সূর্যকে কি ঢাকা যায়!!

কবিতা চক্রবর্তী

রাষ্ট্র যেন এক জমিদারি
ভণ্ড শাসক তার কাণ্ডারী,
সত্যকথন বন্ধ রাখুন
চলছে দেশে কালাকানুন!
আধিপত্যের হবে পতন
ভয় পায় তাই সত্যকথন।
সিংহাসনটা যদি হারায়,
গণতন্ত্রকে তাই ডরায়!
দেশের মানুষ যেন ভূমিদাস
দমন পীড়নে উঠুক শ্বাস!
শ্রমশক্তি নিগড়ে নিয়ে
বাঁধবে কালাকানুন দিয়ে!
শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন
তুলে ধরলেই করবে দমন!
মহামারী অথবা দাঙ্গা,
আসল তথ্য চলবে না!
বাইনারী আর মিথ ভরে
সাজাও গল্প ভালো করে!
শিল্পী কবি নাট্যকার
সমাজসেবী বা পত্রকার,
খোলে যদি মুখোশ ওনার
অন্ধকানুনে ফাটক সবার!
সবাইকে যদি ভাবো দাস
মুখের স্বর্গে তোমার বাস!
রুদ্ধ করলে সত্য সৃজন
তুলবে আওয়াজ সহস্র প্রাণ।
নিজের সৃষ্ট কর্মফলে
নিজেই যাবে রসাতলে।
সূর্যকে কি ঢেকে রাখা যায়
কালো মেঘের অন্তরালে!

আটপৌরে পৃথিবী

তরুণ কান্তি ঘোষ

পুব আকাশে আলোর রেখা পাখির কলতান
কিচিরমিচির কুহু কুহু,কেউ দেয় শীষের টান
আংশুর কিরণ গাছের পাতায় হেসে খেলে যায়
মলয় পবন থেকে থেকে গাছে দোল খায়।

মাটির ওপর সূর্যের তেজ আছাড়ে যখন পড়ে
বাষ্প হয়ে জল তখন ডানা মেলে ওড়ে
গরু, পাখি, মানুষ যারা আপন কাজে মেতে
আস্তে আস্তে ধরা তখন গরম হয় তেতে।

মধ্য গগনে তপন তার ভীষণ তেজ দেখায়
গাছপালা ও সকল জীব গরম তাদের গায়
নীল আকাশে মেঘের ছেলা নাই যে তাদের পাল
ডানা ছাড়া উড়ে বেড়ায় এমনি তাদের হাল।

ঘুমের দেশে যাবার পালা বিকাল শুরু হলে
দূরের মাঠে যায় যে দেখা ভানু ধরার কোলে
লালের চেয়ে বেশি লাল পশ্চিমে যখন হেলে
কালো তখন আস্তে আস্তে ডানা তার মেলে।

হাজার চোখ যায় যে দেখা সারা আকাশের গায়
চোখের পাতা পড়েনা তাদের চেয়ে থাকে ঠায়
দিবস শেষ নিশা শুরু চব্বিশ ঘণ্টার ছবি
এমনিভাবে বেঁচে আছে আটপৌরে পৃথিবী।

রাস্তা

অরুণাভ মালিক

তবে কি অর্থোডক্স ভাবনার প্রসার
ঘটতে চলেছে আমাদের দেশে?
আমরা তো চাইতাম ক্রমশ
উন্নত হোক আমাদের দেশ!
তবে কি সত্যিই ঘটতে চলেছে
বাংলার সেই বাগধারা
যা চেয়েছি তা পাইনা
যা পেয়েছি তা চাইনা!
যেটা সত্যি সেটা হল
মানুষের জীবনের উপলব্ধি!
অর্থোডক্স ভাবনা নাকি রুপান্তর আধুনিক ভাবনা!
তবে প্রয়োজন মানুষের শিক্ষা ও চেতনা!
তবেই হবে ফলপ্রসূ রুপান্তর আধুনিক ভাবনা।
তারই মধ্যে ঘটে যাবে অনেক
সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাত!
ইতিহাস কিন্তু বলে বিকল্পের রাস্তা এটাই।

নারী দিবসে ভারতীয় নারী

রবিব্রত ঘোষ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস আসলেই ভারতে, নারীদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান হতে শুরু করে। এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু অস্বাভাবিক যেটা হলো এই সব অনুষ্ঠানের কিছু স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞ থাকেন ভারতেই তাদের জন্ম কর্ম পড়াশোনা বড় হওয়া তারা এই নারী দিবসের দিনটিতে ভারতীয় নারীরা কত পিছিয়ে আছেন তার একটা লম্বা ফিরিস্তি দিতে শুরু করেন। মাটির সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে প্রচুর বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাই হলে কি সমস্যা হয় এটা তাদের দেখলে বোঝা যায়। পাশ্চাত্যে যে নারীরা সাফল্যের শিখরে উঠেছেন তাদের সাফল্যের গুণগান একমাত্রিক। তারা মূলত নিজেদের কাজের জায়গাতেই চূড়ায় উঠতে পেরেছেন। ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম তারা কাজের জায়গায় তো সাফল্য অর্জন করেছেন তার সঙ্গে সংসার জীবনে ও সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী থেকে আপনার বাড়ির পাশে যে মহিলা দোকান চালান তাকে লক্ষ্য করে দেখুন। কাজ করছেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সম্পূর্ণ ডেডিকেশন দিয়ে। এই ধারাটা কিন্তু ঘরে গিয়েও বজায় রাখছেন ঘরের জন্য কাজ করছেন, স্বামী ছেলে মেয়েরা কি করে আরো ভালো থাকবে তার জন্য ব্যবস্থা করছেন প্রয়োজনে রান্নাও করছেন। আসলে তারা দুটো ফিল্ডেই সংগ্রাম করছেন এবং ঘরের কাজ সামাল দেওয়ার জন্য তাদের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। ঘুম থেকে ওঠার পর শুরু হয়ে গেল যার শেষ রাত্রে বিছানায় যাবার সময়। কাজের জায়গায় উইক অফ আছে সি.এল, ই.এল ইত্যাদি আরো অনেক কিছু আছে। কিন্তু ঘরের কাজে কোন নির্দিষ্ট সময় নেই এবং সিক লিভ ই.এল ছুটির কোনো ব্যাপারই নেই।

সিক লিভ একটা থাকে খুব অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলে। যেমন সবাই চান যে সিক লিভ আরো বাড়িয়ে নিতে, ঘরের ক্ষেত্রে হয় ঠিক তার উল্টোটা কত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারব সেটাই থাকে প্রধান লক্ষ্য।

কাজে মোটিভেশন আনার জন্য চাকরির ক্ষেত্রে অনেক রকম ব্যবস্থা থাকে কিন্তু ঘরের কাজে কোন প্রমোশন নেই কোন ইনক্রিমেন্ট নেই বছর বছর একই কাজ চলছে। তবু মোটিভেশন এর কোনো খামতি নেই। ভারতীয় নারীরা এটা নিয়ে কখনো অভাব অভিযোগ আন্দোলন করেননি বরং একে সানন্দে স্বীকৃতি দিয়েই তারা জীবন কাটিয়েছেন আর বড় থেকে আরও বড় হবার চেষ্টা করেছেন।

পাশ্চাত্যের মহিলাদের এটা দেখতে পাবেন না তারা হয় গুড মাদার হবেন না হলে বাইরে সাকসেসফুল উম্যান হবেন। সংসার এবং কাজের জায়গা দুটোর মধ্যে সমন্বয় করে এগিয়ে যাবার কানা কড়ি চেষ্টাও তাদের মধ্যে পাবেন না। ভারতীয় নারীদের এই বৈশিষ্ট্য গোটা বিশ্বে কোথাও পাবেন না।

কেতাবি বিদ্যা বুদ্ধি বলবে পড়াশুনা না জানলে কিছুই করা যাবে না। ভারতীয় নারীরা এই তত্ত্বটাকে ভুল বলে অনেক আগেই প্রমাণ করে দিতে পেরেছিলেন। গত শতাব্দীর ষাটের দশকেই। কিছু মহিলাদের, যারা তথাকথিতভাবে অত পড়াশোনা করেননি মনে হয়েছিল পুরুষ-নির্ভর না হয় সম্মানের সঙ্গে বাঁচা দরকার। কম পড়াশোনা তাদের ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা জানতেন ঘরোয়া পদ্ধতিতে কি করে পাপড় বানাতে হয়। এই বিদ্যেটাকেই কাজে লাগিয়ে তারা একটি গোষ্ঠী তৈরি করেন। পাপড় বিক্রি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তারা আরো অন্যান্য প্রোডাক্ট তৈরি করতে শুরু করেন। শেষমেষ এটা একটা বৃহত্তর শিল্প সংস্থায় তৈরি হয়। হ্যাঁ এটাই লিজ্জত পাপড়ের ইতিকথা। সবচেয়ে বড় কথা এই প্রতিষ্ঠানে কোন পুরুষদের প্রবেশাধিকার নেই। ছোট থেকে বড় কাজ, কারখানা থেকে বাইরের বিক্রি সমস্ত কিছুটাই সামাল দেন মহিলারা।

ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় কোনো মহিলাদের এরকম প্রয়াস আপনারা দেখতে পাবেন না যেখানে মহিলা ছাড়া কেউই নেই। এবং এ ব্যাপারে তারা কোনো সরকারি বেসরকারি সাহায্য বা মদত পাননি।

এবার ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি ঘটনা বলব, সেই সময় ধীরে ধীরে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু হচ্ছে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন নারী শিক্ষা আন্দোলনগুলি ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে। তবু দিনের শেষে এটাই চিন্তা করা হতো মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া মানেই উন্নত মানের শয্যাসঙ্গিনী পাওয়া। মহিলারাও তাতে আনন্দে স্বীকৃতি দিতেন। কিন্তু যার কথা বলছি তিনি আক্ষরিক অর্থেই অনেকটাই লেখা-পড়া না-জানা ছিলেন। সেই মধ্যযুগীয় পতিই পত্নীর স্বর্গ বা ঈশ্বর। এই ধারণার মূলে একটা আস্ত রকমের কুঠার মারতে পেরেছিলেন। পতির সঙ্গে ঝগড়ায় যাননি কারণ তার কথা বলার মধ্যে এক আশ্চর্য রকম মৃদুতাই ছিল তার শক্তি। আর সেই আশ্চর্য শক্তিকে কাজে লাগিয়েই পতির মতকে অনেক সময় খণ্ডন করেছেন। তার মতের বিরোধিতা করেছেন কিন্তু এমন ভাবে বিরোধিতা করেছেন যে কেউ বুঝতেই পারেননি যে তিনি বিরোধিতা করছেন।

আবার পতি যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিয়ে যেতে এসেছ? সব মহিলার ই যে স্বপ্ন থাকে শারীরিক সুখ, সুখী দাম্পত্য জীবন এবং বাচ্চাকাচ্চা। সেই ধারণাকে এক লহমায় বিসর্জন দিয়ে বলতে পেরেছিলেন না না আমি তোমাকে সাধন পথে সাহায্য করতে যাচ্ছি। আরো পরবর্তীকালে পতির অনুরাগীরা একটা বড় সংগঠন তৈরি করবেন যাতে বাঘা বাঘা বিশ্ববিজয়ী মানুষেরা থাকবেন এর উপরেও শেষ কথা বলার অধিকারটা তিনি নিজের হাতে রেখেছিলেন নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে।

সারদামণি মুখোপাধ্যায় বা আজকের সারদা দেবীর জীবন কাহিনী এটাই। বিপ্লবী আন্দোলন বা প্রতিবাদী আন্দোলনে ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে মহিলারা যোগদান করেছেন। কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই একটা সুইসাইড স্কোয়াডের নেতৃত্ব দেওয়ার ঘটনা হয়েছিল। এই ভারতেই। জয় লাভ করার পরও যিনি ফিরে যাননি ওখানে নিজের জীবনকে বলি দিতে পেরেছিলেন যাতে অন্যরা তার জীবন দেখে উদ্দীপ্ত হয়। আক্ষরিক অর্থেই নিরস্ত্র কিন্তু ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশ যাদের হাতে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র তবু নিজের কর্তব্যে অবিচল থেকে গুলি খেয়ে প্রাণ ত্যাগ করা। প্রীতিলতা বা মাতঙ্গিনী হাজরার মতো মহিলা অন্য দেশে কিন্তু চট করে খুঁজে পাবেন না।

নিজে পেশায় উকিল। কিন্তু মনে হয়েছিল নিম্ন বিত্ত বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভীষণ রকম পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কিছু করা দরকার। তাদের জন্য শুরু করেছিলেন স্বল্প সঞ্চয় ব্যবস্থা। যেটা কিছুদিনের মধ্যেই গোটা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বৃহৎ ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প হিসেবে পরিণত হয়েছিল। হ্যাঁ এটাও এক ভারতীয়র কীর্তি। তিনি ছিলেন একজন মহিলা ইলা ভাট।

আসলে এটাই ভারতীয় নারী। যাদের ভেতরে প্রচণ্ড শক্তি আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সেটা কখনো শেখানো হয়নি।। যখনই তারা নিজেরা এটা জানতে পেরেছে তারা বিরাট বড় একটা বিপ্লব করে দিতে পেরেছে। কিন্তু প্রচারের ঢক্কা নিনাদের সঙ্গে যেহেতু তারা পারঙ্গম নন। তাই প্রচারের আলো তাদের কাছে পড়েনি। আর আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা অসাধারণ কাজকে দেখতেও পারেননি বরং তারা আদর্শ খোঁজার জন্য বিদেশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন।

ভারতীয় নারীদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করা, তাদেরকে বিশ্লেষণ করার সময় কিন্তু এসে গেছে।

কারণ ফিজিক্সের থিওরি দিয়ে কেমিস্ট্রিকে বোঝা যাবে না। বায়োলজির কনসেপ্ট দিয়ে সোশিয়লজি, ইতিহাসকে বোঝা যাবে না।

পাশ্চাত্য বা ইউরোপের নারীবাদী থিওরি দিয়ে ভারতীয় নারীদের কে বোঝা যাবে না।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

QR কোড স্ক্যান করে সরাসরি আপনি টাকা পাঠাতে পারেন।

—তিনের পাতার পর

পথ দেখিয়েছেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত

কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে, তখন এ বই শিখে বিবি সেজে বিলেতে বোল কবেই কবে।"

খুব সাম্প্রতিক একটি টিভি চ্যানেলের একচ্ছত্র সঞ্চালক যাকে আধুনিক সাংবাদিকতার ভাষায় বলে তারকা এ্যাঙ্কার —তিনি খুব সম্প্রতি ডেঙ্গি পরিস্থিতির খবরের সূচনা করতে গিয়ে পুরসভার ব্যর্থতা সম্পর্কে বলেছিলেন "রাতে মশা, দিনে মাছি, এই তাড়য়ে কলকাতায় আছি।" এই কথায় শুধু ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা নয়, সাংবাদিকতার মানে উজ্জ্বল হয়। বাংলা সাহিত্যে জন্মভূমিকে জননী বলে প্রথম আখ্যায়িত করেন তিনি। এবং আজও প্রজাতন্ত্র বা স্বাধীনতা দিবসের খবরের শিরোনামে এই চরণ ব্যবহার করাই যায় "জননী ভারতভূমি, আর কেন থাকো তুমি, ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে।" আবার ২১শে ফেব্রুয়ারি বা ১৯শে মে-এর ভাষা দিবসের খবরের প্রাসঙ্গিকতায় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা তুলনীয়। যেমন "মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা, তুমি তার সেবা করো সুখে।" আবার বর্তমানে মদের অধিক ব্যবহার বা মদের বাড়বাড়ন্ত বা নিষিদ্ধ মদের অধিক ব্যবহারের খবরের বিন্যাস করতে গেলে সহজেই প্রাসঙ্গিক সূত্রে বলা যায় 'ধন্য রে বোতলবাসী, ধন্য লাল জল'।

শুধু নিজের কবিতায় বা কাব্য রচনাই নয়, তিনি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থের প্রচুর সাংবাদিকসুলভ সাহিত্যিক মনোভাবাপন্ন চারণেরও তিনি ভক্ত ছিলেন। যেমন 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন', 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' ইত্যাদি।

ঈশ্বর গুপ্ত শুধুমাত্র আধুনিক কবি বা সাংবাদিক ছিলেন না। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগন্দিশারী—যে সাহিত্য এবং সাংবাদিকতা হাত ধরাধরি করে চললে বুদ্ধির সংস্কৃতি অনেক পরিস্থিতির হয়। এবং তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় সামঞ্জস্য বিধান করে সমান্তরাল ভাবে তার সাম্যতা বজায় রেখেছিলেন।

নতুন চিঠি প্রকাশিত

কিছু গ্রন্থ যা পাওয়া যাচ্ছে

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ

মূল্য : ৩০০ টাকা

ড. শান্তনু কুমার ঘোষ প্রণীত

প্রকৃতি, মানুষ ও বিবর্তিত বাজার ব্যবস্থা

মূল্য : ২০০ টাকা

কাজি আব্দুল করিম সম্পাদিত সদ্য প্রকাশিত

জননেতা রামনারায়ণ গোস্বামী

মূল্য : ৩৮০ টাকা

এছাড়াও আমাদের সঙ্গে যুক্ত লেখকদের গ্রন্থও পাওয়া যায়আমাদের দপ্তরে

নতুন চিঠি

৬২, বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-৭১৩১০১

এছাড়াও পাবেন এনবিএ কলকাতা ও তার বিভিন্ন শাখায়

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন

- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র
- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- ই-মেলে লেখা পাঠান ইউনিকোডে কম্পোজ করে।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

নতুন চিঠি

৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১ ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩
Visit our website : www.natunchithi.co.in
email : weeklynatunchithi@gmail.com

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-